International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 9-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.9-15

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসনীয়’ ও ‘রাঘব মালাকার’: প্রসঙ্গ বস্ত্র সংকট

ড. রিন্টুদাস
সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

At the time of world war and famine, the humanity was totally lost in the society. The businessmen stored all the goods in their warehouse and created artificial crisis. As a result of this, abnormal price rise started. Not only food items, cloths were also vanished from the market. Women were compelled to cover their body with jute bags, towels etc. as these was a huge scarcity of cloths. Even they prayed for their death as they had nothing to cover their body. This kind of horrible situation is nicely depicted by Manik Bandyopadhyay in his short stories. His famous stories named ‘Duhshasanio’ and ‘Raghab Malakar’ are the two true examples of such situation. Though in the story ‘Duhshasanio’, we can see a picture of surrender in the crisis period, but at the same time we see a protest and fighting spirit in the story ‘Raghab Malakar’. Our main focus is to highlight this kind of situation and contradictory approach of the writer in these two stories.

Key words: Cloth-crisis, Degeneration, Protest, Humanity, Contradiction

‘কল্লোল’ সমসাময়িক কালে লেখালেখি শুরু করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীভুক্ত লেখক ছিলেন না। সাহিত্যে জীবনের বাস্তবতার রূপায়নই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞানের ছাত্র মানিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বাস্তব সচেতন যুক্তিবাদী মনোভাব তাঁর রচনাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক নানা সংকট মানিককে বিচলিত করে তুলেছিল। পরবর্তীতে অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট, মন্বন্তর, মহামারী, বস্ত্র সংকট প্রভৃতি নানা বিপর্যয় মানিকের লেখায় প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিতে সরাসরি যোগদানও নীতিগতভাবে এবং রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তাঁর মনন ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণগত ভিন্ন মাত্রা নিয়ে এসেছে। চিরাচরিত পুরানো মূল্যবোধ ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়েছে। মানিক নতুন মূল্যবোধের কথা রূপায়িত করেছেন তাঁর লেখায়। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু মূলত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিপন্ন মূল্যবোধ ও মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিচার ক্রতে পারি। মানিকের সংবেদনশীল মন সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের সুখ-দুঃখ ও সমস্যার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জীবনযন্ত্রনায় বিচলিত মানিক নতুন কোনো আদর্শ জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেননি। তবে কমিউনিস্ট

পার্টিতে যোগদানের পর তিনি সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের নিপীড়নের চিত্র শুধু তুলে ধরেননি। পাশাপাশি কিছু গল্পে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে বিকল্প পথ হিসেবে দেখিয়েছেন। মানিকের সমগ্র সাহিত্য জীবনের মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা দেখবো বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য তাঁর রচনাগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে।

একজন আদর্শবান লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নবিত্ত ও মেহনতি মানুষকে বেঁচে থাকার পথনির্দেশ করতে এবং মুক্তির সন্ধান দিতে ব্যাকুল হ্যে উঠেছিলেন। তাঁর এই ব্যাকুলতা জীবনের শেষ পর্বের গল্পগুলিতে বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। লেখক জীবনের শুরুর দিকে তাঁর রচনায় যে ভুল-ত্রুটিগুলো ছিল, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তা অনেকাংশে সংশোধিত হয়—একথা মানিক নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মার্কসবাদ মানবতাকে অগ্রগতির সঠিক দিশা নির্দেশ করতে পারবে। সামাজিক সাম্য আনতে হলে শোষিত ও মেহনতি মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরে পেতে হবে। আর সেই অধিকার ফিরে পেতে হলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ছাড়া ভিন্ন পথ নেই। সংবেদনশীল মানিক মানুষের অন্তরমহলের চিত্রকে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। অন্যদিকে অবক্ষয়িত সমাজ ও চরম অব্যবস্থার চিত্রকেও নিপুণ শিল্পীর মতো পর্যবেক্ষণ করে শিল্পরূপ দান করেছেন।

বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছিল। ব্যবসায়ী ও মুনাফালোভিরা সমস্ত দ্রব্য গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে। ফলে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। শুধু খাদ্যসামগ্রী নয়, কাপড়ও বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। কাপড়ের অভাবে গামছা, চট, বস্তা যখন যা জুটেছে তাই দিয়ে মেয়েরা তাদের লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করেছে। যখন তাও জোটেনি তখন মৃত্যু কামনা করেছে। এই নিদারুণ বস্ত্র সংকটের বিভীষিকাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে শিল্পরূপ দান করেছেন। মানিকের ‘দুঃশাসনীয়’ ও ‘রাঘব মালাকার’ গল্পে বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতা ও মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে ‘দুঃশাসনীয়’ গল্পে বিপদের মাঝে আত্মসমর্পণ থাকলেও ‘রাঘব মালাকার’ গল্পে আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য এই দুটি গল্পের মাধ্যমে বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈপরীত্যের দিকটিকে তুলে ধরাই আমাদের মূল অন্বিষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসনীয়’ ও ‘রাঘব মালাকার’ ভয়াবহ বস্ত্র সংকটের প্রেক্ষিতে লেখা হলেও গল্পদুটির মেজাজ ভিন্ন। মানিকের জীবনের শেষ পর্যায়ের লেখায় সমষ্টিচেতনা সর্বাত্মক রূপ লাভ করেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নিম্ন শ্রেণির মানুষের জীবনসমস্যা যে একই মানিক তা উপলব্ধি করেছিলেন। হাতিপুর গ্রামের সমষ্টিগত জীবন দুঃশাসনীয় গল্পের মূল উপজীব্য। এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র নিদারুণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার শিকার হয়েছে। গল্পে দুই শ্রেণির মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত, জীবনধারণের জন্য যারা মনুষ্যত্ব ও নারীত্বকে বিকিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, ক্ষীণ প্রতিবাদের পর যারা সামাজিক সমস্যার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। হাতিপুর গ্রামের অতীত ও বর্তমানের দুস্তর ব্যবধানের কথা বলে গল্পের সূচনা করেছেন লেখক। গ্রামবাংলার ভয়াবহ বস্ত্রসংকটকে সরাসরি বর্ণনা না করে লেখক ছায়ার দ্যোতনায় দ্যোতিত করেছেন। নির্মম সত্যের বাস্তব রূপকার মানিক অসামান্য ভাষার শিল্পীত সুষমায় মণ্ডিত করে কঠিন বাস্তবকে রূপ দান করেছেন,

"কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"[১]

মহাভারতের যুগে পৌঁছে মানিক কুরুসভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদীর অন্তহীন 'রূপক বস্ত্র'কে বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে 'সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই আঁধার ঘিরে রয়েছে দ্রৌপদী-রূপী 'ছায়াকে'। ছায়ার মুখে সংলাপ দিয়ে কায়িক রূপ দান করেছেন লেখক। মহাভারতের দ্রৌপদীর লাঞ্ছিত একক সত্তা বহু নারীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সমষ্টি জীবন যেহেতু গল্পকারের লক্ষ্য, তাই একের পর চরিত্র এসে তাদের কথা বলে অন্তরালে চলে গেছে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে সংলাপ শোনা গেলেও মূল বক্তব্য থেকে তারা কেউই সরে যায়নি। গল্পের প্রথম সংলাপটি শোনা যায় ভোলা নন্দীর পুত্রবধূ পাঁচীর কণ্ঠে। বৈকুণ্ঠমালিক ও তার স্ত্রী মানদার সংলাপে হাতিপুর তথা সমগ্র বাংলাদেশের জীবনযন্ত্রনা রূপ পেয়েছে। খাবারের অভাবে সবাই শাক-পাতা খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাপড়ের অভাবে মেয়েরা মৃত্যু কামনা করছে। কাপড়ের অভাবে গ্রামের মেয়েরা ধুতি, গামছা, চট যা পেয়েছে তাই ব্যবহার করছে। যখন এগুলোর কিছুই জোটেনি সেদিনের সেই ভয়ংকর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন,

"...বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া। ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে, কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে।"[২]

কাপড়ের অভাবে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল অসহায় নারীদের ওপর তার প্রত্যক্ষ অভিঘাত নেমে এসছিল। এই অন্ধকার চিত্রের পাশাপাশি লেখক প্রকৃতির সুন্দর ও সৌম্য রূপকে উপস্থাপন করেছেন,

"সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা — কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা।" [৩]

এই বিপরীতধর্মী চিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিকে আরো প্রকট করে তুলেছেন। মানদা ও পাঁচীর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই বেনারসি শাড়ি পড়া গকুলের বোন মালতীকে। মালতীর মতোই অন্ধকার থেকে আলোর অভিসারী হতে দেখি বিপিন সামন্ত, রঘু ও দাসু কামারের মেয়ে বিন্দুকে। বিপরীত জীবনবোধের দিকটি তুলে ধরার মাধ্যমে গল্পকারের নিরপেক্ষ শিল্পীসত্তা আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

এই গল্পে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতেও গল্পকার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্ত্রহীনাদের অন্যতম দুই চরিত্র আমিনা ও রাবেয়া। রাবেয়া ও আনোয়ারের দ্বন্দ্ব এবং রাবেয়ার অভিযোগের মধ্য দিয়ে বস্ত্রসংকটের করুণ চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন লেখক। রাবেয়ার প্রথম উক্তিতেই সে কথা স্পষ্ট হয়েছে,

"রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।"[৪]

আমিনার মধ্যেও এই মৃত্যুচিন্তা আবর্তিত হয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে তারা খুঁজে পেতে চেয়েছে সমাধানের পথ। সামাজিক অব্যবস্থার শিকার কয়েকটি পরিবারের মধ্য দিয়ে গল্পকার বস্ত্রসংকটের নগ্ন ও নারকীয় রূপকে তুলে ধরেছেন।

‘দুঃশাসনীয়’ গল্পে চরিত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে সামান্য প্রতিবাদ লক্ষ করা গেলেও সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তারা সক্ষম হয়নি। সংঘবদ্ধভাবে সমাজে বদল আনার কোনো প্রয়াস তারা দেখাতে পারেনি। আনোয়ার, ভোলা প্রমুখের মধ্যে দেখা গেছে হতাশা। রাবেয়ার মতো নারীরা কবরে গিয়ে চিরকালের মতো নিশ্চিত আশ্রয় নেবার কথা ভেবেছে। তাদের ক্ষীণ প্রতিবাদ, ব্যক্তিগত হতাশা ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা হাতিপুরকে উলঙ্গ হাতিপুরে পরিণত করেছে। গল্পের শেষে রাবেয়ার মধ্যে কোনো প্রতিবাদ বা অভিযোগ লক্ষ করা যায় না। জীবনের নগ্নতাকে দুহাতে আলিঙ্গন করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক চরম প্রশান্তির অভিমুখে যাত্রা করেছে সে। সমষ্টিগত জীবনসমস্যাকে দূর করতে হলে যে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হতো সেই প্রচেষ্টা গল্পের চরিত্রদের মধ্যে দেখা যায়নি। আর তাই সমাজের অব্যবস্থা ও সমস্যাকে জিইয়ে রেখে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যে আলো পেলে ‘ছায়া’দের মুক্তি ঘটতো সেটা সম্ভব হয়নি। বস্ত্রসংকটের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আশাহত চিত্তেদিকভ্রষ্ট পথের প্রান্তে এসে তারা দাঁড়িয়েছে।

‘দুঃশাসন’ গল্পের মতোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন গ্রামবাংলার বস্ত্রসংকট ‘রাঘব মালাকার’ গল্পেরও উপজীব্য। কিন্তু বিষয় এক হলেও রূপগত দিক থেকে ‘রাঘব মালাকার’ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। তাছাড়া ‘দুঃশাসন’ গল্পে আনোয়ারদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দ্রৌপদী-রূপী রাবেয়ারা দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তি পায়নি। অপরদিকে ‘রাঘব মালাকার’ গল্পে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বস্ত্রসংকটের মতো সমস্যা থেকে মুক্তির চেষ্টা লক্ষ করা যায়। যদিও সমষ্টিগত প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি বলে সংকট থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি সম্ভব হয়নি। সমাজে সমষ্টিগত সচেতনতা সেভাবে গড়ে না উঠলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। মানিকের সেই মতাদর্শের কথা বলতে গিয়ে জনৈক আলোচক জানিয়েছেন,

> “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একদিকে যেমন এনেছে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সর্বস্তরের দুর্নীতি অনাচার তেমনি অন্যদিকে এনেছে নতুন আশা ভরসা। সাম্যবাদী আদর্শ জনমানসকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। এই পথ প্রতিবাদের, বিরুদ্ধতার, সংগ্রামের, ধনিক গোষ্ঠীর হাত থেকে সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে শোষিত মানুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার। মানিক এই মতবাদে দীক্ষিত। সেজন্য তাঁর রচনায় আছে এই নতুন আলোর নিশানা।”[৫]

সমাজে সমষ্টির সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হলে যে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের দরকার এই অমোঘ সত্যকে মানিক এই গল্পের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। ‘রাঘব মালাকার’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাঘব পরিস্থিতির শিকার হয়ে চোরাকারবারীর কাপড়ের গাঁট পৌঁছে দেয় ভিন্ন গ্রামে। একসময় রাঘবের সংবেদনশীল মন গ্রামের মানুষদের জন্য কাতর হলে চোরাকারবারীর কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে বস্ত্রহীনদের মধ্যে। কিন্তু একক মানুষের জ্বলন্ত প্রতিবাদ ও প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত নিভে যায় সমষ্টিচেতনার অভাবে।

‘দুঃশাসনীয়’ গল্পে মানিক আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন মহাভারতের যুগে। আনোয়ারদের মতো স্বামীদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য এযুগের দ্রৌপদী রাবেয়াদের অকালে চলে যেতে হয় পৃথিবী থেকে। ‘রাঘব

মালাকার' গল্পে পুরাণের অনুষঙ্গ এনে এক বিদ্রূপাত্মক আবহ তৈরি করেছেন গল্পকার। মূল কাহিনিতে প্রবেশের আগে এইধরণের অবতারণা গল্পের গঠনগত অভিনবত্বকে প্রকাশ করেছে,

> "পুরাণে বলে একদা নররূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি...এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখেছেন, তা তিনিই জানেন ...তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকার,....মনকে সান্ত্বনা দিও। আশা করি এই ছোট্ট কাহিনিটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন...."[৬]

এই অসমাপ্ত বাক্যে প্রসঙ্গের রেশ রেখে গল্পকার অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে মূল কাহিনি আরম্ভ করেছেন,

> "রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।"[৭]

গল্পের মূল কাহিনির শুরুতে রাঘবের বর্তমান অবস্থার পরিচয় দিয়ে ফ্ল্যাশব্যাক রীতির মাধ্যমে পারম্পর্য রক্ষা করেছেন লেখক। প্রথমেই নির্জন পথের রহস্যময় পরিবেশের নিপুণ চিত্র অংকন করেছেন তিনি। এই নির্জন পথের দৃশ্যের পাশাপাশি সমাজের আসল রূপটিও ফুটে উঠেছে। যে সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই গল্প আবর্তিত হয়েছে সেই সমস্যা আনয়নকারী চোরাকারবারির দালাল গৌতম দাস। ব্যবসায়ীরা রাতারাতি বড়োলোক হবার আশায় কালোবাজারির মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের বঞ্চিত করে তাদের প্রাপ্য কাপড় লুকিয়ে বিক্রি করে। এই ধরণেরই একজন ব্যবসায়ী গৌতম।গৌতমের বিশ্বস্ত অনুচর পত্তু গ্রামের রাঘব মালাকার কাপড়ের বোঝা মাথায় করে নিয়ে যায়। রাঘবের গ্রাম 'পত্তু'তে রাঘব ও গৌতম হাজির হলে সেখানকার জীবনের নির্মম রূঢ়তা ও নিস্তব্ধতা রাঘবের সুপ্ত সত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। সে বস্ত্রহীনদের জন্য কাপড় প্রার্থনা করেছে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাসভাজন রাঘব একসময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। রাঘবের এই প্রতিবাদ গৌতমের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছে। আর সেই ভয়কে গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টায় সে গর্জন করে উঠেছে। ভয়াবহ বস্ত্রসংকট নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে রাঘবের কথায়,

> "মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর ? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—".[৮]

রাঘবের মনের এই পরিবর্তন গৌতমের অশালীন মন্তব্যে মেঘমন্দ্র গর্জনে বলিষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করল। রাঘবের 'হাঁকে' মৃতপ্রায় পত্তু গাঁ হয়ে ওঠে জীবন্ত। গল্পে সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

পত্তু গ্রাম ও তার আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে জড়ো হয়। গৌতম এবার ভয় পেয়ে পালাতে চায়। কিন্তু রাঘবরা তাকে ছেড়ে দিতে নারাজ। কারণ ছেড়ে দিলে গৌতম তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবে।এদিকে চতুর গৌতম নিজে মুখে চোরাই কাপড়ের কথা স্বীকার করে জানায়,

> "পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কী জবাব দেব বল ? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের।" [৯]

এ কথা শুনে রাঘবরা গৌতমকে ছেড়ে দেয়। গ্রামের মানুষদের মধ্যে আমরা নতুন কয়েকটি চরিত্রকে পাই— নরহরি, তিনজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এবং বলরাম। রাঘব সকলের মধ্যে কাপড় বন্টন করতে চায়। নরহরি ও তিনজন মাঝবয়সী লোক রাঘবের প্রতি প্রতিকূলতা দেখালেও বলরাম রাঘবের প্রতি অনুকূল মনোভাব সম্পন্ন।

গল্পের এই মুহূর্তটি নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ। পত্তু গ্রামে প্রবেশের আগে কাহিনি সমান্তরাল গতিতে চলছিল। কিন্তু এই গ্রামে আসার পরই ঘটনায় নাটকীয় মোর নেয়। দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী রাঘব গৌতমের বিশ্বাস ভঙ্গ করেতার চোরাই কাপড় গ্রামের মানুষদের মাধ্যে বিলিয়ে দিতে চায়। এদিকে পরদিন গৌতম কাপড়ের দলিলপত্র তৈরি করে পুলিশ নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। কিন্ত গ্রামে গিয়ে দেখে পর্যাপ্ত কাপড় না থাকায় কাপড়ের ভাগ নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে। দাঙ্গায় রাঘব গুরুতর আহত। তার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সে বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। যে গ্রামের মানুষদের নগ্নতা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে তাদেরই হাতে নিগৃহীত হয়ে মৃত্যুশয্যায় রাঘব। ফ্ল্যাশব্যাকে মূল কাহিনি শুরু করার আগে যে দুটি বাক্যের মধ্য দিয়ে রাঘবের পরিণতিকে তুলে ধরেছিলেন লেখক, সেই দুটি বাক্যের মাধ্যমেই গল্প শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু এবারে বাক্য দুটির স্থান পরিবর্তন হয়েছে। শোষক ও অন্যায়কারীর মোকাবিলা করতে হলে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দরকার। রাঘব সেই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার এহেন ব্যর্থতা প্রমাণ করে দেয় সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য মানুষ তখনও প্রস্তুত নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' ও 'রাঘব মালাকার' গল্পদুটির মূল প্রতিপাদ্য বস্ত্র সংকট হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈপরীত্যের দিকটি সুস্পষ্ট। আমরা জানি জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটেছে একাধিকবার। মানিক নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। তাঁর নীতি ও আদর্শ একটা বিশেষ রাজনীতি তথা জীবনাদর্শের বিস্তৃত পরিসরে স্থির হবার সুযোগ পায়। এ প্রসঙ্গে মানিক বলেছেন,

> "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীর ভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁক ও ফাঁকি আগেও আমি রা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানী করেছি—জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।" [১০]

সমাজে অবহেলিত ও শোষিত মানুষের প্রতি মানিকের সহমর্মিতা ছিল। তাই অনেক গল্পে অত্যাচারিত ও সর্বহারা মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের আলোচ্য 'দুঃশাসনীয়' গল্পে বস্ত্র সংকটের যে সমস্যার চিত্র দেখতে পাই সেখানে প্রতিরোধের সুযোগ ছিল। কিন্তু গল্পকার নিপীড়িত মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে 'রাঘব মালাকার' গল্পে আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের সুর শোনা যায়। যদিও একক প্রতিবাদ সংঘবদ্ধ রূপ পায়নি। সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদের জন্য যে মানসিক বল ও সমষ্টি চেতনার দরকার তা সমাজে ছিল না। আসলে 'রাঘব মালাকার' গল্পের পরিণতির মধ্য দিয়ে লেখক সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন। তবে যে প্রতিরোধ তিনি 'দুঃশাসনীয়'তে দেখাতে পারেননি তা 'রাঘব মালাকার' গল্পে অসামান্য নৈপুণ্য ও সততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. রায় অলক, বসু অরুণ কুমার, বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, প্রমুখ সম্পাদিত ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র’ পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০, পৃষ্ঠা ১৭৩।

২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৩।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৪।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৫।

৫. মিত্র সরোজমোহন, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য’, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১২, পৃষ্ঠা ১৬৫।

৬. রায় অলক, বসু অরুণ কুমার, বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ প্রমুখ সম্পাদিত ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র’ পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০, পৃষ্ঠা ২১৮।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ২১৮।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ২২০।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ২২২।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত ‘মানিক গ্রন্থাবলী’, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৫।